১। প্রশ্নঃ বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান বর্ণনা কর ?

উঃ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত, যা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীপ্রণালীর পলল দ্বারা গঠিত।
অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য:
অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ: বাংলাদেশ 20^\circ 34' উত্তর অক্ষাংশ থেকে 26^\circ 38' উত্তর অক্ষাংশ এবং 88^\circ 01' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে 92^\circ 41' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের প্রায় মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করায় এটি ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।
সীমানা:
উত্তরে: ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য।
পূর্বে: ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্য এবং মিয়ানমার।
পশ্চিমে: ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য।
দক্ষিণে: বঙ্গোপসাগর।
আয়তন: বাংলাদেশের মোট আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গ মাইল।
স্থলসীমা: বাংলাদেশের মোট স্থলসীমার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,৭১১ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতের সাথে ৩,৭১৫ কিলোমিটার এবং মিয়ানমারের সাথে ২৮০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে।
জলসীমা: বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগরে এর মহীসোপানের শেষ সীমা পর্যন্ত সামুদ্রিক মালিকানা রয়েছে।
ভূ-প্রকৃতি:
বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:
* টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ:
  * এগুলো বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ভূমিরূপ।
  * দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম (বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি) এবং কক্সবাজার জেলার পূর্বাংশে অবস্থিত। এগুলোর গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়, তবে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিং ডং (বিজয়)।
  * উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ: সিলেট জেলার উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এগুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত।
* প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ:
  * এগুলো বরফ যুগের সময় গঠিত হয়েছিল এবং এর মাটির রং লাল ও ধূসর।
  * বরেন্দ্রভূমি: দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম প্লাইস্টোসিন যুগের উচ্চভূমি।
  * মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়: টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড় অবস্থিত।
  * লালমাই পাহাড়: কুমিল্লা শহরের পশ্চিমে অবস্থিত।
* সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি:
  * এটি বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির সিংহভাগ (প্রায় ৮০%) জুড়ে বিস্তৃত।
  * পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা এবং এদের অসংখ্য উপনদী ও শাখানদী দ্বারা বাহিত পলিমাটি দিয়ে এই সমভূমি গঠিত হয়েছে।
  * এই অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর এবং কৃষিকাজের জন্য খুবই উপযোগী। দেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই নদীবিধৌত পলল দ্বারা গঠিত সমভূমি।
জলবায়ু:
বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির। বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী অবস্থান এবং মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে গ্রীষ্ম বা শীত কোনোটাই খুব তীব্র হয় না।
* গড় তাপমাত্রা: বার্ষিক গড় তাপমাত্রা প্রায় 25^\circ থেকে 26^\circ সেলসিয়াস। উষ্ণতম মাস এপ্রিল এবং শীতলতম মাস জানুয়ারি।
* বৃষ্টিপাত: এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, বিশেষ করে বর্ষাকালে (জুন-সেপ্টেম্বর)। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২০৩ সেন্টিমিটার, তবে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে (যেমন সিলেট) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বাধিক।
* ঋতু: বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ, যা আবহাওয়ার বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে। গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও বৃষ্টিবহুল এবং শীতকাল শুষ্ক হয়।

* প্রাকৃতিক দুর্যোগ: এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রবণতা দেখা যায়। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও নদীবাহিত জলপ্রবাহের কারণে বন্যা একটি সাধারণ ঘটনা।

২ । প্রশ্নঃ বাঙালি জাতিকে কেন সংকর জাতি বলা হয় ?
উঃ বাঙালি জাতিকে 'সংকর জাতি' বলার মূল কারণ হলো ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ এবং অভিবাসনের মাধ্যমে এই জাতির নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং উর্বর ভূমি প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করেছে, যার ফলে সময়ের পরিক্রমায় এখানে বহু জাতির আগমন ঘটেছে এবং তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে গেছে।
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ
বাঙালি জাতি গঠনে যেসব প্রধান জাতিগোষ্ঠীর অবদান রয়েছে, সেগুলো হলো:
* অনার্য জনগোষ্ঠী (প্রাক-আর্য):
  * নেগ্রিটো: মনে করা হয়, বাংলার প্রথম দিকের আদিবাসী ছিল নেগ্রিটোরা। এদের কিছু বংশধর এখনও সাঁওতাল, ভীল, মুন্ডা, হাড়ি, চন্ডাল, ডোম ইত্যাদি উপজাতির মধ্যে দেখা যায়।
  * অস্ট্রিক: প্রায় ৫০০০ বছর আগে ইন্দোচীন থেকে আগত এই জনগোষ্ঠীকে বাঙালি জাতির মূল অংশ বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশের সাঁওতাল, বাঁশফোড়, রাজবংশীসহ অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে এদের সম্পর্ক রয়েছে। এরা 'নিষাদ জাতি' নামেও পরিচিত ছিল।
  * দ্রাবিড়: সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা হিসেবে পরিচিত দ্রাবিড়রা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে বাংলায় এসেছিল। তারা অস্ট্রিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং বাঙালি জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
  * মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয়: উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত এই জনগোষ্ঠী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের সাথে মিশে যায়। বাংলাদেশের গারো, চাকমা, ত্রিপুরা, কোচ ইত্যাদি উপজাতি মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত।
* আর্য জনগোষ্ঠী:
  * খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের দিকে মধ্য এশিয়া থেকে আগত আর্যরা একসময় ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে তাদের বাংলায় আগমন ঘটে। স্থানীয় অনার্য জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের সংমিশ্রণ ঘটে, যা বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক গঠনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। আর্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত।
* পরবর্তীকালের আগত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী:
  * সেমিটিক গোত্রের আরবীয়: খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আরব বণিক ও ধর্মপ্রচারকরা বাংলায় আগমন করেন এবং স্থানীয়দের সাথে মিশে যান।
  * তুর্কি, আফগান, পারসিক ও মোঘল: বিভিন্ন সময়ে মুসলিম শাসকরা (তুর্কি, আফগান, মোঘল) এবং পারস্য থেকে আগতরা বাংলায় শাসন ও বসতি স্থাপন করেন, যার ফলে তাদের রক্ত ও সংস্কৃতির ধারাও বাঙালি জাতির সাথে মিশে যায়।
  * পর্তুগিজ, আর্মেনীয়, ইংরেজ: ঔপনিবেশিক যুগে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠী যেমন পর্তুগিজ, আর্মেনীয় এবং ইংরেজরাও বাংলায় বসতি স্থাপন করে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের সংমিশ্রণ ঘটে।
সংমিশ্রণের কারণ ও প্রভাব
* ভৌগোলিক অবস্থান: বাংলাদেশের উর্বর ভূমি এবং নদীমাতৃক বৈশিষ্ট্য প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসতি স্থাপনের জন্য অনুকূল ছিল।
* বাণিজ্যিক কেন্দ্র: বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী হওয়ায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল, যা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে এখানে টেনে এনেছিল।
* ধর্ম প্রচার: বিভিন্ন ধর্মীয় প্রচারক এবং সুফি-সাধকরা ইসলামসহ অন্যান্য ধর্ম প্রচারে এসে স্থানীয়দের সাথে মিশে যান।
* শাসন ও অভিবাসন: বিভিন্ন সময়ে বিদেশি শাসক ও তাদের অনুসারীরা এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।
এই দীর্ঘদিনের সংমিশ্রণের ফলেই বাঙালি জাতির মধ্যে শারীরিক বৈচিত্র্য (গাত্রবর্ণ, উচ্চতা, মুখের গড়ন), ভাষাগত বৈচিত্র্য (বিভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষা), এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য (খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, রীতিনীতি) পরিলক্ষিত হয়। এই বহুত্ববাদই বাঙালি জাতিকে একটি 'সংকর জাতি' হিসেবে পরিচিত করে তুলেছে।

৩। প্রশ্নঃ সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা বলতে কী বুঝায় ?
উঃ সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা (Cultural Syncretism) বলতে বোঝায় বিভিন্ন সংস্কৃতির উপাদান, বিশ্বাস, রীতিনীতি এবং অনুশীলনগুলো একত্রিত হয়ে একটি নতুন ও অনন্য সাংস্কৃতিক রূপ তৈরি করা। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে দুটি বা ততোধিক ভিন্ন সংস্কৃতি একে অপরের সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের মধ্যে আদান-প্রদান ঘটে এবং এর ফলে একটি নতুন মিশ্র সংস্কৃতি বা 'হাইব্রিড সংস্কৃতি' গড়ে ওঠে।
সমন্বয়বাদিতার মূল বৈশিষ্ট্য:
* মিশ্রণ ও একীকরণ: এখানে কেবল পাশাপাশি সহাবস্থান নয়, বরং বিভিন্ন সংস্কৃতির উপাদানগুলো একে অপরের সাথে মিশে গিয়ে নতুন কিছু তৈরি করে। যেমন, একটি ধর্মীয় উৎসব অন্য ধর্মের কিছু আচার গ্রহণ করতে পারে, বা একটি ভাষার সাথে অন্য ভাষার শব্দ মিশে যেতে পারে।
* আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ: যখন বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ অভিবাসন, বাণিজ্য, বিজয়, উপনিবেশ স্থাপন বা বিশ্বায়নের কারণে একে অপরের কাছাকাছি আসে, তখনই এই সমন্বয়বাদিতা দেখা যায়।
* পরিবর্তন ও বিবর্তন: সংস্কৃতি স্থির নয়, এটি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। সমন্বয়বাদিতা এই পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ ও গতিশীল করে তোলে।
* নতুন পরিচয়ের সৃষ্টি: সমন্বয়বাদের ফলে কেবল নতুন অনুশীলনই জন্ম নেয় না, বরং এটি একটি সমাজের বা জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়কে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে।
সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতার উদাহরণ:
বাঙালি সংস্কৃতিকে প্রায়শই সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়, কারণ এর উপর আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয়, তুর্কি, পারসিক, মুঘল, আফগান, পর্তুগিজ, ব্রিটিশ ইত্যাদি অসংখ্য জাতিগোষ্ঠী ও সভ্যতার প্রভাব রয়েছে। এর কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:
* ভাষা: বাংলা ভাষা নিজেই বহু ভাষার শব্দ গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। আরবি, ফারসি, তুর্কি, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষার অসংখ্য শব্দ বাংলা ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে।
* ধর্মীয় সহাবস্থান ও আদান-প্রদান: বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান—সব ধর্মের মানুষ centuries ধরে পাশাপাশি বাস করে আসছে। এর ফলে তাদের উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান এবং লোকবিশ্বাসের মধ্যে এক ধরনের আদান-প্রদান ঘটেছে। যেমন, পীর-আউলিয়াদের প্রতি শ্রদ্ধা বা মাজার সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামি ও স্থানীয় লোকবিশ্বাসের সমন্বয় দেখা যায়। আবার, কিছু হিন্দু উৎসবে মুসলিমদের অংশগ্রহণ বা মুসলিমদের কিছু অনুষ্ঠানে হিন্দুদের উপস্থিতি বাঙালির সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির পরিচায়ক।
* স্থাপত্য: বাংলার স্থাপত্যে ইসলামিক ও ভারতীয় (হিন্দু) স্থাপত্যশৈলীর মিশ্রণ দেখা যায়, যা ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য নামে পরিচিত। আদিনা মসজিদ বা ছোট সোনা মসজিদের মতো স্থাপনাগুলো এর চমৎকার উদাহরণ।
* খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক: লুঙ্গি, শাড়ি, পায়জামা-পাঞ্জাবি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পিঠা, পোলাও, বিরিয়ানি, রুটি—এসবই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফল।
* সংগীত ও শিল্পকলা: লোকসংগীত, বাউল গান, জারি-সারি গান, এবং অন্যান্য শিল্পকলায় বিভিন্ন ধর্মীয় ও আঞ্চলিক প্রভাবের সমন্বয় বিদ্যমান।
সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা কেবল একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিশ্বায়ন ও আধুনিকতার প্রভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতি আরও বেশি করে একে অপরের সংস্পর্শে আসছে, যার ফলে নিত্যনতুন সমন্বয়বাদী রূপগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি।

৪। প্রশ্নঃ ধর্মীয় সহনশীলতা বলতে কি বুঝ ?

উঃ ধর্মীয় সহনশীলতা বলতে বোঝায় অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, তাদের বিশ্বাস ও প্রথাকে মেনে নেওয়া এবং শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করা, এমনকি সেই বিশ্বাস বা প্রথার সাথে নিজের ব্যক্তিগত মতের মিল না থাকলেও। এর মানে এই নয় যে আপনাকে অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে হবে বা আপনার নিজস্ব বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে, বরং এর মানে হলো অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি সম্মান জানানো এবং তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করা।
ধর্মীয় সহনশীলতার মূল দিকগুলো:
* শ্রদ্ধা ও গ্রহণযোগ্যতা: বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলনের প্রতি সম্মান দেখানো এবং সেগুলোকে গ্রহণ করার মানসিকতা রাখা।
* শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান: বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একে অপরের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারা এবং তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলন নির্বিঘ্নে অনুসরণ করতে পারা।
* বৈষম্যহীনতা: ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত পরিচয়ের কারণে কাউকে বৈষম্যের শিকার না করা।

* মত প্রকাশের স্বাধীনতা: প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশ এবং পালনের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া।
* সংলাপ ও বোঝাপড়া: বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আলোচনা ও সংলাপে অংশগ্রহণ করা।

কেন ধর্মীয় সহনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ?

* সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা: ধর্মীয় সহনশীলতা একটি সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। যখন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, তখন সংঘাত ও বিদ্বেষ কমে আসে।
* মানবাধিকার রক্ষা: ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার। সহনশীলতা এই অধিকারকে নিশ্চিত করে।
* সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি: বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ যখন একত্রিত হয়, তখন নতুন ধারণা, শিল্পকলা এবং জীবনধারা জন্ম নেয়, যা একটি সমাজকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।
* প্রগতি ও উন্নয়ন: সহনশীল পরিবেশ জ্ঞানচর্চা, উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক।
* জাতীয় ঐক্য: একটি বহু-ধর্মীয় রাষ্ট্রে ধর্মীয় সহনশীলতা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাঙালি সংস্কৃতিতে ধর্মীয় সহনশীলতার একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ centuries ধরে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে এবং একে অপরের উৎসবে অংশগ্রহণ করে আসছে। এটি আমাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৫। প্রশ্নঃ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরিচয় দাও ?

উঃ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) ছিলেন একজন প্রখ্যাত বাঙালি রাজনীতিবিদ এবং পাকিস্তানের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী। অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাকে বাংলাদেশের আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষা

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৮৯২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর অবিভক্ত বাংলার মেদিনীপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা স্যার জাহিদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেন এবং গ্রে'স ইন থেকে ব্যারিস্টারি ডিগ্রি অর্জন করেন।

রাজনৈতিক জীবন

সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯২০-এর দশকে। তিনি ছিলেন স্বরাজ পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

* কলকাতা পৌরসভার মেয়র: ১৯২৪ সালে তিনি কলকাতা পৌরসভার ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে ১৯৩৭ সালে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
* বেঙ্গল মুসলিম লীগের নেতৃত্ব: ১৯৩০-এর দশকে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং দ্রুতই এর অন্যতম প্রধান নেতায় পরিণত হন। তার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ বাংলার রাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে।
* অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী: ১৯৪৬ সালে সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এটি ছিল তার রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সময় তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করেন, বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় যখন কলকাতায় ব্যাপক দাঙ্গা দেখা দেয়। মহাত্মা গান্ধী সেই সময় তার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিলেন।
* স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা: ১৯৪৭ সালের দেশভাগের প্রাক্কালে তিনি শরৎচন্দ্র বসুর সাথে 'অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা' গঠনের একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা সফল হয়নি।
* পাকিস্তান গঠনের পর: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি মুসলিম লীগের বিরোধিতায় লিপ্ত হন এবং পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সোচ্চার হন। ১৯৪৯ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ) গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
* যুক্তফ্রন্ট গঠন: ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে পরাজিত করে পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠন করে, যা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।
* পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী: ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি 'এক ইউনিট' ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন, যা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব

পাকিস্তানের সমতা আনয়নের একটি চেষ্টা ছিল কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানিদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তিনি দেশের সংবিধান প্রণয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
মৃত্যু
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর লেবাননের বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যু বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করে।
অবদান ও পরিচিতি
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার দূরদর্শিতা, বাগ্মিতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান এবং বিচারক। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে তার ভূমিকা ছিল পরোক্ষ কিন্তু সুদূরপ্রসারী। তিনি বাঙালিদের অধিকারের পক্ষে ছিলেন এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে বাঙালিদের ন্যায্য হিস্যার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তার রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মপন্থা পরবর্তী প্রজন্মের বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তাকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অগ্রদূতদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৬ । প্রশ্নঃ যুক্তফ্রন্ট কেন গঠিত হয়েছিল?

উঃ ১৯৫৪ সালের পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায় করার লক্ষ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। এর প্রধান তিনটি শরিক দল ছিল:
১. আওয়ামী মুসলিম লীগ (নেতৃত্ব: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও পরবর্তীতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী)
২. কৃষক শ্রমিক পার্টি (নেতৃত্ব: শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক)
৩. নেজামে ইসলাম পার্টি (নেতৃত্ব: মাওলানা আতাহার আলী)
এছাড়াও খেলাফতে রব্বানী পার্টিসহ কয়েকটি ছোট দল এর সাথে যুক্ত হয়েছিল।
যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল কারণগুলো:
* মুসলিম লীগের ব্যর্থতা ও জনবিচ্ছিন্নতা: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে (১৯৪৭ সাল) মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। তারা আঞ্চলিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছিল। জনগণের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রতি তীব্র অসন্তোষ ছিল।
* ভাষা আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের দাবি: ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতি গভীর আবেগ তৈরি করে। মুসলিম লীগ সরকার বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় গড়িমসি করায় জনগণ তাদের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রথম দফাই ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।
* অর্থনৈতিক বৈষম্য: পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করছিল। পূর্ব পাকিস্তানের পাট এবং অন্যান্য সম্পদের আয় পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছিল, অথচ পূর্ব পাকিস্তানে দারিদ্র্য বাড়ছিল। শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের অভাবে সাধারণ মানুষ চরম হতাশ ছিল।
* রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের অভাব: পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ওপর নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছিল। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তাই জোরালো হয়ে উঠেছিল।
* নির্বাচনে ক্ষমতা ধরে রাখার কৌশল: মুসলিম লীগ ১৯৫১ সালের নির্ধারিত নির্বাচন বারবার স্থগিত করছিল, কারণ তারা বুঝতে পারছিল যে জনগণের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা তলানিতে। এই স্থগিতাদেশ জনগণের অসন্তোষকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
* জনপ্রিয় নেতাদের ঐক্য: শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো জনপ্রিয় ও অভিজ্ঞ নেতাদের নেতৃত্বে এই তিনটি প্রধান বিরোধী দল একত্রিত হওয়ায় এটি জনগণের কাছে এক শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। তাদের এই ঐক্য মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য অপরিহার্য ছিল।
২১ দফা কর্মসূচি:
যুক্তফ্রন্ট তাদের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে, যা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার প্রতিফলন ছিল। এর কিছু উল্লেখযোগ্য দফা ছিল:
* বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।
* জমিনদারি প্রথা বাতিল করা।
* পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করা।

* কৃষকদের জন্য কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা।
* সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি।
* বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা।
* শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

এই ২১ দফা কর্মসূচি জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ভূমিধস বিজয় লাভ করে। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৭। প্রশ্নঃ সামরিক শাসনের বৈশিষ্ট্য সমূহ সংক্ষেপে লিখ ?

উঃ সামরিক শাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হলো:
সামরিক শাসন (Military Rule) হলো এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে দেশের শাসনভার সামরিক বাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনীর হাতে থাকে। এটি সাধারণত একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এবং গণতান্ত্রিক সরকারের অনুপস্থিতি বা দুর্বলতা এর প্রধান কারণ।
সামরিক শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:
১. গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি: সামরিক শাসনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো গণতন্ত্র, অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত সরকারের অনুপস্থিতি। এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ দ্বারা সরকার গঠিত হয় না।
২. ক্ষমতা দখল: সামরিক শাসন সাধারণত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে শুরু হয়, যাকে সামরিক অভ্যুত্থান (Coup d'état) বলা হয়। কোনো নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটিয়ে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করে।
৩. একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ: সামরিক শাসকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রায় সব ক্ষেত্রে (আইন প্রণয়ন, বিচার ও নির্বাহী) নিজেদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। আইনসভা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব হয়।
৪. সেনাপ্রধান বা সামরিক প্রধানের নেতৃত্ব: সাধারণত সামরিক বাহিনীর প্রধান বা একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন হন এবং তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন।
৫. রাজনৈতিক কার্যকলাপ সীমিত বা নিষিদ্ধকরণ: সামরিক সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সভা-সমাবেশ, মিছিল, প্রতিবাদ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয় এবং রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন করা হয়।
৬. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হর্ব: সংবাদমাধ্যম ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে খর্ব করা হয়। সরকারের সমালোচনা কঠোর হাতে দমন করা হয় এবং তথ্যের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
৭. আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোরতা: সামরিক শাসনে সাধারণত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় চরম কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দ্রুত বিচার বা শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।
৮. মৌলিক অধিকারের সীমাবদ্ধতা: জনগণের মৌলিক অধিকার যেমন - বাক স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে সীমিত করা হয়।
৯. প্রশাসনের সামরিকীকরণ: বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয় এবং বেসামরিক কর্মকর্তাদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।
১০. সংবিধান স্থগিত বা বাতিল: অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধান স্থগিত করা হয় বা সম্পূর্ণ বাতিল করে একটি সামরিক আইন (Martial Law) জারি করা হয়, যা সামরিক শাসকের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয়।
১১. জাতীয়তাবাদী বা স্থিতিশীলতার নামে শাসন: সামরিক শাসকরা প্রায়শই নিজেদের ক্ষমতাকে বৈধতা দিতে জাতীয় নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা রক্ষা বা দুর্নীতি দমনের অজুহাত দেখিয়ে থাকে।
১২. আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা: অনেক সময় সামরিক শাসনের কারণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এবং আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা বা চাপের সম্মুখীন হতে হয়।
সংক্ষেপে, সামরিক শাসন হলো একটি কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা যা গণতন্ত্রের মূলনীতিকে অস্বীকার করে এবং জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে সামরিক শক্তির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।

৮ । প্রশ্নঃ ১৯৫৬ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য সমূহ লিখ ?

উঃ ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কার্যকর হয়। দীর্ঘ ৯ বছর ধরে সংবিধান প্রণয়নের চেষ্টার পর এই সংবিধানটি গৃহীত হয়েছিল। যদিও এটি ১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাতিল হয়ে যায়, তবুও এর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল:

১. লিখিত ও বৃহৎ সংবিধান:
১৯৫৬ সালের সংবিধান ছিল লিখিত এবং তুলনামূলকভাবে বৃহৎ। এতে একটি প্রস্তাবনা, ১৩টি অংশ, ২৩৪টি অনুচ্ছেদ এবং ৬টি তফসিল ছিল।
২. ইসলামিক প্রজাতন্ত্র:
এই সংবিধানের মাধ্যমে পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক নাম "ইসলামিক প্রজাতন্ত্র" (Islamic Republic of Pakistan) হিসেবে গৃহীত হয়। সংবিধানে উল্লেখ করা হয় যে, কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না এবং ইসলামী আদর্শসমূহকে রাষ্ট্রীয় নীতি ও সামাজিক জীবনে প্রতিফলন করার চেষ্টা করা হবে। রাষ্ট্রপতিকে মুসলিম হতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়।
৩. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা:
সংবিধানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সরকারের প্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপতি। মন্ত্রিসভা আইনসভার (জাতীয় পরিষদ) কাছে জবাবদিহি করত।
৪. এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা:
সংবিধানে একটি এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার (জাতীয় পরিষদ) ব্যবস্থা রাখা হয়। এই পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জনসংখ্যার সমতা নীতি (Parity) গ্রহণ করা হয়, যেখানে প্রতিটি প্রদেশ থেকে ৮০ জন করে মোট ১৬০ জন সদস্য নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল। তবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অসন্তোষ ছিল, কারণ তারা জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের সমান সংখ্যক আসন পেয়েছিল।
৫. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা:
সংবিধানে পাকিস্তানকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের জন্য তিনটি তালিকা (কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং সমকালীন) তৈরি করা হয়। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শক্তিশালী ক্ষমতা সংরক্ষিত ছিল এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সীমিত ছিল।
৬. দ্বি-রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ও উর্দু:
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফলস্বরূপ এই সংবিধানে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এটি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি দীর্ঘদিনের দাবি ছিল।
৭. মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতি:
সংবিধানে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকারের (যেমন: বাক স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি) নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, রাষ্ট্র পরিচালনার কতিপয় নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of State Policy) অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা সরকারের জন্য একটি দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হয়।
৮. স্বাধীন বিচার বিভাগ:
সংবিধানে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগের কথা বলা হয়। সুপ্রিম কোর্টকে সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং সংবিধানের ব্যাখ্যা ও মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা হয়।
৯. সরাসরি নির্বাচন:
জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়।
১০. কঠোর সংবিধান (আংশিকভাবে):
সংবিধানটি আংশিকভাবে কঠোর ছিল। এর কিছু অংশ সাধারণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পরিবর্তন করা গেলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংশোধনের জন্য আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন ছিল।
তবে, এই সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয়নি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা আরও সুসংহত হয়েছিল বলে অনেক পূর্ব পাকিস্তানি মনে করতেন। এই সংবিধান মাত্র আড়াই বছর কার্যকর থাকার পর ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে বাতিল করা হয়।

৯। প্রশ্নঃ জাতীয়তাবাদ বলতে কি বুঝ ?

উঃ জাতীয়তাবাদ (Nationalism) একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মতবাদ যা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণ পরিচয়, ঐক্যের অনুভূতি এবং স্বশাসনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে। সহজ ভাষায়, এটি হলো একটি জাতির প্রতি গভীর ভালোবাসা, আনুগত্য এবং নিজ জাতিকে অন্যান্য সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার মানসিকতা।
মূল ধারণা:

জাতীয়তাবাদ এই ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর (যাদের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ধর্ম, বংশগত যোগসূত্র, ভৌগোলিক অবস্থান, বা অভিন্ন অভিজ্ঞতা—এর এক বা একাধিক উপাদান সাধারণ থাকে) একটি অভিন্ন পরিচয় ও ভাগ্য রয়েছে। এই জনগোষ্ঠী একটি "জাতি" (nation) হিসেবে নিজেদের সংজ্ঞায়িত করে এবং বিশ্বাস করে যে তাদের নিজেদের দ্বারা শাসিত হওয়ার অধিকার রয়েছে, অর্থাৎ একটি স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র গঠন করা।
জাতীয়তাবাদের উপাদানসমূহ:
জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার পেছনে বেশ কিছু উপাদানের ভূমিকা থাকে। এর মধ্যে প্রধানগুলো হলো:
* ভাষা ও সাহিত্য: একই ভাষাভাষী হওয়া এবং সেই ভাষার মাধ্যমে একটি অভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ জাতীয়তাবোধকে সুদৃঢ় করে। যেমন, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ছিল মূল ভিত্তি।
* সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য: একটি জাতির অভিন্ন সংস্কৃতি, রীতিনীতি, উৎসব, লোককথা, শিল্পকলা এবং ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলে।
* ইতিহাস: একটি অভিন্ন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, তা সংগ্রাম, বিজয়, বা ভোগান্তির ইতিহাসই হোক না কেন, মানুষকে একই পরিচয়ে আবদ্ধ করে। ঐতিহাসিক স্মৃতি ও প্রতীকগুলো জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়।
* ভূগোল: একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাস এবং সেই ভূখণ্ডের প্রতি একাত্মতা অনুভব করা জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদান।
* ধর্ম (কিছু ক্ষেত্রে): যদিও এটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে ধর্ম একটি জাতিকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এটি যদি বিভেদ সৃষ্টি করে, তবে তা জাতিগঠনের পথে অন্তরায়ও হতে পারে। (যেমন, পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং পরবর্তীতে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ।)
* জাতিগত বা বংশগত ঐক্য (কিছু ক্ষেত্রে): যদিও আধুনিক জাতীয়তাবাদ প্রায়শই জাতিগত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে ওঠে, তবে কিছু জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অভিন্ন বংশগত বা জাতিগত উৎস জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হতে পারে।
* অর্থনৈতিক স্বার্থ: অনেক সময় অর্থনৈতিক শোষণ বা বৈষম্য থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা একটি জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলে।
* রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা: স্বশাসন, স্বাধীনতা এবং নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে কাজ করে।
জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক:
জাতীয়তাবাদের যেমন ইতিবাচক দিক রয়েছে, তেমনি নেতিবাচক দিকও থাকতে পারে।
ইতিবাচক দিক:
* স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ: পরাধীন জাতিগুলোর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে জাতীয়তাবাদ প্রেরণা যোগায়।
* ঐক্য ও সংহতি: একটি জাতিকে অভ্যন্তরীণভাবে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করতে সাহায্য করে।
* সাংস্কৃতিক বিকাশ: নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশে উৎসাহ দেয়।
* উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি: একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করতে উৎসাহিত করে।
নেতিবাচক দিক:
* সংকীর্ণতা ও উগ্রতা: উগ্র জাতীয়তাবাদ অন্য জাতি বা সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা তৈরি করতে পারে, যা যুদ্ধ ও সংঘাতের জন্ম দেয়।
* সাম্রাজ্যবাদ: শক্তিশালী জাতিগুলো উগ্র জাতীয়তাবাদের নামে দুর্বল দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাইতে পারে।
* জাতিগত শুদ্ধিকরণ: বর্ণবাদ বা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে জাতিগত নিধন বা বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল একটি ইতিবাচক শক্তি যা বাঙালি জাতিকে একত্রিত করে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে।

১০ । প্রশ্নঃ ১৯৬২ সালের সংবিধানে বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ ?

উঃ ১৯৬২ সালের সংবিধান ছিল পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান, যা জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারির পর (১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে) নিজে প্রণয়ন ও কার্যকর করেছিলেন। এটি ছিল একটি রাষ্ট্রপতি-শাসিত সংবিধান এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১৯৬২ সালের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:
১. লিখিত ও বৃহৎ সংবিধান:
১৯৬২ সালের সংবিধান ছিল একটি লিখিত ও সুদীর্ঘ দলিল। এটি ১২টি অংশ, ২৫০টি অনুচ্ছেদ এবং ৫টি তফসিল নিয়ে গঠিত ছিল।
২. রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ব্যবস্থা:
এটি ছিল এই সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ১৯৫৬ সালের সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে রাষ্ট্রপতি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধান এবং তার হাতে ব্যাপক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রধানমন্ত্রীর কোনো পদ ছিল না।
৩. প্রজাতন্ত্রের নাম পরিবর্তন:
১৯৬২ সালের সংবিধানে প্রথমে পাকিস্তানের নাম "রিপাবলিক অব পাকিস্তান" রাখা হয়েছিল। তবে পরে প্রথম সংশোধনীতে এটিকে "ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান" করা হয়। সংবিধানে কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোনো আইন না করার বিধান রাখা হয় এবং রাষ্ট্রপতিকে মুসলিম হওয়ার শর্ত দেওয়া হয়।
৪. এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা:
সংবিধানে একটি এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার (জাতীয় পরিষদ) ব্যবস্থা রাখা হয়। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫৬ জন (পরবর্তীতে সংশোধন করে ৩০০ করা হয়), যার অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে এবং অর্ধেক পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হতেন। নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনও ছিল।
৫. মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracies) ব্যবস্থা:
এটি ছিল আইয়ুব খানের নিজস্ব উদ্ভাবন। এই সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এবং আইনসভার সদস্যরা প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন না, বরং 'মৌলিক গণতন্ত্রী' (Basic Democrats) নামে পরিচিত ৮০,০০০ নির্বাচিত প্রতিনিধির একটি নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হতেন (পরে এই সংখ্যা ১,২০,০০০ করা হয়)। এই মৌলিক গণতন্ত্রীরা স্থানীয় পরিষদগুলোর সদস্য ছিলেন এবং তারাই রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের জন্য পরোক্ষভাবে ভোট দিতেন। এই ব্যবস্থা জনগণের সরাসরি ভোটাধিকারকে খর্ব করেছিল।
৬. ফেডারেল ব্যবস্থা (দুর্বল):
সংবিধানে পাকিস্তানকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র বলা হলেও বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল অত্যন্ত সীমিত। প্রাদেশিক গভর্নররা রাষ্ট্রপতির অনুগত ছিলেন এবং তাদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রবল। এটি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী ছিল।
৭. মৌলিক অধিকারের সীমাবদ্ধতা:
সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও, সেগুলোর উপর নানা রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করে এই অধিকারগুলো স্থগিত করতে পারতেন।
৮. কঠোর সংবিধান:
সংবিধানের সংশোধন প্রক্রিয়া বেশ জটিল ছিল। যেকোনো সংশোধনী কার্যকর করার জন্য জাতীয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রপতি ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন।
৯. স্বাধীন বিচার বিভাগ (সীমাবদ্ধ):
বিচার বিভাগকে স্বাধীন বলা হলেও, বিচারকদের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ব্যাপক ক্ষমতা ছিল, যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে সীমিত করে।
১০. জরুরি ক্ষমতা:
রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরি অবস্থা জারির ব্যাপক ক্ষমতা ছিল, যা জাতীয় নিরাপত্তা বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের অজুহাতে ব্যবহৃত হতে পারত।
এই সংবিধানটি মূলত আইয়ুব খানের ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য প্রণীত হয়েছিল এবং এটি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক ও স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ, এই সংবিধান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অসন্তোষ আরও বাড়িয়ে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

১১ । প্রশ্নঃ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল ?

উঃ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত এবং ব্যাপকভিত্তিক একটি আন্দোলন। সামরিক শাসক আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে এই অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো ছিল বহুমুখী এবং পূর্ব বাংলার জনগণের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।
প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ:
১. আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান:
গণঅভ্যুত্থানের প্রধান এবং তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পদত্যাগ এবং তার 'মৌলিক গণতন্ত্র' (Basic Democracies) ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটানো। জনগণ প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ফিরে পেতে চেয়েছিল, যা মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।
২. গণতান্ত্রিক অধিকার ও সংসদীয় পদ্ধতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা:
১৯৬২ সালের সংবিধানে প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি-শাসিত পদ্ধতির পরিবর্তে জনগণ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, যেখানে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হবেন। বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকারসহ সকল মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল অন্যতম দাবি।
৩. পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা:
১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের সনদ হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা। এর মধ্যে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি বাদে সকল ক্ষমতা প্রদেশের হাতে ন্যস্ত করার দাবি ছিল।
৪. অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান:
পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করা হচ্ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ ব্যবহার করে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন করা হলেও, পূর্ব পাকিস্তান ছিল অবহেলিত। গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঘটানো, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ন্যায্য অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা।
৫. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি:
১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। গণঅভ্যুত্থানের একটি অন্যতম দাবি ছিল এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি। এই দাবি আদায়ে জনগণ এতটাই সোচ্চার ছিল যে, শেষ পর্যন্ত আইয়ুব সরকার মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।
৬. শিক্ষানীতির পরিবর্তন ও শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা:
আইয়ুব সরকারের শিক্ষানীতি ছিল গণবিরোধী এবং শিক্ষার সুযোগ সীমিত করার লক্ষ্যে প্রণীত। শিক্ষার্থীরা এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিল। গণঅভ্যুত্থানের একটি উদ্দেশ্য ছিল একটি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।
৭. সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা বাস্তবায়ন:
গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে, যা শুধু ছাত্রদের দাবি নয়, পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ছিল। এই ১১ দফার মধ্যে ছয় দফা, মৌলিক অধিকার, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণসহ প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষের দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল এই ১১ দফা বাস্তবায়ন।
ফলাফল:
১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান আইয়ুব খানের শাসনের পতন ঘটায় এবং সামরিক শাসনের অবসান হয়। এর ফলে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করতে বাধ্য হন। এই নির্বাচনই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে কাজ করে। গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরও সুসংহত করে এবং মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে কাজ করে।

১২। প্রশ্নঃ অপারেশন সার্চলাইট কী ?

উঃ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত একটি পূর্বপরিকল্পিত ও নৃশংস সামরিক অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান

বাংলাদেশ) চলমান বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করা এবং বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া।
অপারেশন সার্চলাইটের উদ্দেশ্য:
* রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করা: এই অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা, ছাত্রনেতা এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার ও প্রয়োজনে হত্যা করা, যাতে বাঙালি জাতি নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে।
* বাঙালি সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীকে নিরস্ত্র করা: তৎকালীন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (EBR), ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (EPR) এবং পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করা এবং তাদের অস্ত্রাগার দখল করা।
* গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দখল: ঢাকা সহ পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহরগুলোর সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, যেমন - রেডিও স্টেশন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, অস্ত্রাগার, বিশ্ববিদ্যালয় হল, পুলিশ লাইন, ইপিআর সদর দফতর ইত্যাদি দখল করে নেওয়া।
* অসহযোগ আন্দোলন দমন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।
* গণহত্যা ও ভীতি সৃষ্টি: ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে বাঙালির মনে ভীতি সৃষ্টি করা, যাতে তারা আর কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে।
অপারেশন সার্চলাইটের বাস্তবায়ন:
১৯৭১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর এক বৈঠকে এই অভিযানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এর মূল পরিকল্পনা তৈরি করেন। ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সালের গভীর রাতে (রাত প্রায় ১১:৩০টা থেকে) পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে এসে ফার্মগেট এলাকায় মিছিলরত বাঙালিদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে এই অভিযানের সূচনা করে। একই সাথে পিলখানা (ইপিআর সদর দফতর), রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (বিশেষ করে ইকবাল হল, জগন্নাথ হল ও রোকেয়া হল), এবং পুরনো ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালানো হয়। রাত ১:৩০ মিনিটে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ফলাফল:
অপারেশন সার্চলাইট ছিল ইতিহাসের অন্যতম বর্বরোচিত গণহত্যা। এই অভিযান বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে দমাতে পারেনি, বরং এটি বাঙালি জাতিকে আরও ঐক্যবদ্ধ করে তোলে এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করে। এই গণহত্যার ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ বাঙালি ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৩। প্রশ্নঃ মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের একটি চিত্র তুলে ধর ?

উঃ
১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের (বিশেষ করে রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী) দ্বারা পরিচালিত একটি সুপরিকল্পিত ও জঘন্যতম গণহত্যা। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করে সদ্য স্বাধীন হতে যাওয়া বাংলাদেশকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়া, যাতে দেশটি মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।
বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের চিত্র:
১. সময়কাল ও ব্যাপকতা:
যদিও বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরুর পর থেকেই চলছিল, তবে এর সবচেয়ে ভয়াবহ ও পরিকল্পিত অংশটি সংঘটিত হয় বিজয়ের মাত্র কয়েকদিন আগে, বিশেষ করে ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে। এই দিনটিকে বাংলাদেশে 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের সহযোগীরা এই চূড়ান্ত আঘাত হানে।
২. লক্ষ্যবস্তু:
এই হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন সমাজের শ্রেষ্ঠ ও আলোকিত মানুষেরা। এদের মধ্যে ছিলেন:
* শিক্ষাবিদ (বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, স্কুল-কলেজের শিক্ষক)
* চিকিৎসক
* সাংবাদিক

* সাহিত্যিক ও লেখক
* বিজ্ঞানী
* আইনজীবী
* শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
* প্রকৌশলী
* দার্শনিক এবং অন্যান্য পেশাজীবী ও চিন্তাবিদ।

৩. হত্যাকাণ্ডের পদ্ধতি:

* তালিকা প্রণয়ন: পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা এবং তাদের এদেশীয় সহযোগী আল-বদর, আল-শামস বাহিনী পূর্ব থেকেই বুদ্ধিজীবীদের একটি তালিকা তৈরি করে রেখেছিল। স্বাধীনতার পর ঢাকার তৎকালীন গভর্নর হাউসে (বর্তমান বঙ্গভবন) মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর ফেলে যাওয়া ডায়েরিতে অনেক নিহত ও নিখোঁজ বুদ্ধিজীবীর নাম পাওয়া যায়, যা এই পরিকল্পনার প্রমাণ।
* অপহরণ ও নির্যাতন: ১০ থেকে ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে কারফিউর সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেত। তাদের চোখ বেঁধে বিভিন্ন নির্যাতন কেন্দ্রে (যেমন: মিরপুর, মোহাম্মদপুর, নাখালপাড়া, রাজারবাগ, ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার) নিয়ে যাওয়া হতো।
* নির্মম হত্যা: নির্যাতন শেষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে, গুলি করে বা অন্যান্য বর্বরোচিত উপায়ে তাদের হত্যা করা হতো। এরপর তাদের মৃতদেহ ঢাকার রায়েরবাজার বধ্যভূমি, মিরপুর বধ্যভূমিসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ফেলে রাখা হতো। স্বাধীনতার পর এসব বধ্যভূমিতে অসংখ্য ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার অনেকগুলোই শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

৪. জড়িত পক্ষ:

এই হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, ব্রিগেডিয়ার বশিরসহ উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তারা এর সাথে জড়িত ছিলেন। তবে মাঠ পর্যায়ে এই নৃশংসতা বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন থেকে রূপান্তরিত আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী। রাজাকার বাহিনীও তাদের সহযোগিতা করেছিল।

৫. কিছু উল্লেখযোগ্য শহীদ বুদ্ধিজীবী:

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন:

* অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (বাংলা সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ)
* অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব (দর্শনশাস্ত্রবিদ)
* অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (ইংরেজি সাহিত্যিক)
* অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা সাহিত্যিক)
* অধ্যাপক আনোয়ার পাশা (বাংলা সাহিত্যিক)
* ডা. ফজলে রাব্বী (চিকিৎসক)
* ডা. আলিম চৌধুরী (চিকিৎসক)
* শহীদুল্লাহ কায়সার (সাংবাদিক, সাহিত্যিক)
* সিরাজুদ্দীন হোসেন (সাংবাদিক)
* সেলিনা পারভীন (সাংবাদিক)
* আলতাফ মাহমুদ (সুরকার, সঙ্গীতশিল্পী)
* জহির রায়হান (চলচ্চিত্রকার, সাহিত্যিক)

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ছিল বাঙালি জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। এর মাধ্যমে পাকিস্তানিরা একটি স্বাধীন দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চেয়েছিল, যাতে নবগঠিত বাংলাদেশ জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে। তবে তাদের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত সফল হয়নি, বরং বাঙালি জাতি আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে বিজয় অর্জন করে। এই দিনটি প্রতি বছর গভীর শ্রদ্ধা ও বেদনার সাথে স্মরণ করা হয়।

১৪। প্রশ্নঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা আলোচনা করো ?

উঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল এক অবিস্মরণীয় নাম, যা শুধু একটি প্রচারমাধ্যম ছিল না, এটি ছিল মুক্তিকামী বাঙালির সাহস, অনুপ্রেরণা এবং প্রতিরোধের প্রতীক। যুদ্ধের ৯ মাস ধরে এটি মুক্তিযোদ্ধাদের এবং দেশের আপামর জনসাধারণকে অদম্য মনোবল জুগিয়েছিল, যা চূড়ান্ত বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও বিবর্তন:
মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে স্বল্প পরিসরে "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" নাম ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করা হয়। এরপর পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের মুখে এটি বারবার স্থান পরিবর্তন করে। প্রাথমিকভাবে কালুরঘাটে স্থাপিত হলেও, পরবর্তীতে এটি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা এবং অবশেষে কলকাতার বালীগঞ্জে পূর্ণাঙ্গ রূপে কার্যক্রম শুরু করে। অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার এটিকে তাদের প্রধান প্রচারমাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে।
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রধান ভূমিকাগুলো:
১. মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র হিসেবে: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল মুজিবনগর সরকারের আনুষ্ঠানিক মুখপত্র। এর মাধ্যমে সরকারের নির্দেশনা, যুদ্ধের অগ্রগতি, আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করা হতো। এটি জনগণের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রমের সর্বশেষ তথ্য পৌঁছে দিত এবং গুজব প্রতিরোধে সহায়ক ছিল।
২. প্রেরণা ও মনোবল বৃদ্ধিতে: দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে যখন মানুষ চরম অনিশ্চয়তা ও ভয়ের মধ্যে ছিল, তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল তাদের একমাত্র ভরসা। 'চরমপত্র'-এর মতো অনুষ্ঠানগুলো রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের এবং দেশের সাধারণ মানুষকে হাস্যরসের মাধ্যমে উদ্দীপনা জোগাত। যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যেও এই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গান, কবিতা ও কথিকা আপামর জনতাকে সাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করত।
৩. সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলায়: পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালির সংস্কৃতি ও ভাষার ওপর আঘাত হেনেছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বাংলা ভাষা, গান, কবিতা ও সাহিত্যকে প্রচার করে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দেশাত্মবোধক গানগুলো প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে নতুন করে স্বাধীনতার স্বপ্ন বুনে দেয়। "জয় বাংলা বাংলার জয়", "পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে" – এমন অসংখ্য গান মুক্তিযোদ্ধাদের পাথেয় হয়েছিল।
৪. জনগণকে সংগঠিত করায়: এই বেতার কেন্দ্র শুধু খবর পরিবেশন বা বিনোদনই দিত না, এটি জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সংগঠিত হতে অনুপ্রাণিত করত। যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানানো হতো এবং বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষকে যার যার অবস্থান থেকে যুদ্ধে ভূমিকা রাখার জন্য উৎসাহিত করা হতো।
৫. আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত খবর, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদনগুলো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোতেও প্রচারিত হতো, যা বিশ্ব জনমতকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিয়ে আসতে সহায়ক হয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বাঙালি এবং স্বাধীনতাকামী মানুষ এই বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারতেন।
৬. পাকিস্তানি বাহিনীর অপপ্রচারের বিরুদ্ধে: পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তাদের নিজস্ব প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালাত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য পরিবেশন করে মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করত।
৭. মুক্তিযোদ্ধাদের বার্তা আদান-প্রদানে: অনেক সময় এটি রণাঙ্গনে থাকা বিভিন্ন মুক্তি বাহিনীর ইউনিটের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করত, যদিও এটি সরাসরি সামরিক যোগাযোগ কেন্দ্র ছিল না।
উপসংহার:
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র একটি সীমিত সরঞ্জাম এবং প্রতিকূল পরিবেশেও একটি বিশাল দায়িত্ব পালন করেছিল। এর কলাকুশলী, সাংবাদিক, শিল্পী এবং টেকনিশিয়ানরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে কাজ করেছেন। এই বেতার কেন্দ্র বাঙালির মনোজগতে যে স্বাধীনতার বীজ বুনে দিয়েছিল, তা থেকেই মহীরুহের মতো অঙ্কুরিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৫ । প্রশ্নঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর ?

উঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা
১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল জটিল ও বহুমুখী। সরাসরি হস্তক্ষেপ না করলেও, জাতিসংঘ বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ, মানবিক সহায়তা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।
১. রাজনৈতিক ভূমিকা ও বিতর্ক:
জাতিসংঘ সরাসরি কোনো সামরিক হস্তক্ষেপ করেনি, মূলত পরাশক্তিগুলোর (বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) ভেটো ক্ষমতার কারণে।
* নিরাপত্তা পরিষদে অচলাবস্থা: যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বেশ কয়েকবার বৈঠক করলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। একদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাকিস্তানের পক্ষে ছিল এবং যে কোনো

যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের হুমকি দিত। অন্যদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের (এবং বাংলাদেশের) পক্ষে ছিল এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপের বিরোধিতা করত। এর ফলে নিরাপত্তা পরিষদে একটি অচলাবস্থা বিরাজ করছিল।
* সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব: নিরাপত্তা পরিষদে ব্যর্থতার পর বিষয়টি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত হয়। সাধারণ পরিষদে যুদ্ধবিরতি, যুদ্ধবন্দীদের মানবিক আচরণ এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার চেয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। যদিও এই প্রস্তাবগুলো আইনত বাধ্যতামূলক ছিল না, তবে এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল।
* বাংলাদেশের সদস্যপদ: যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ দ্রুতই জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে। কিন্তু ১৯৭২ সালে চীন বাংলাদেশের সদস্যপদের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করে। পরবর্তীতে, ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।
২. মানবিক ভূমিকা:
রাজনৈতিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও, জাতিসংঘ মানবিক সংকট মোকাবিলায় একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে:
* শরণার্থী সহায়তা: যুদ্ধের সময় প্রায় ১ কোটি বাঙালি ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয় (UNHCR) এই শরণার্থীদের জন্য খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসা ও অন্যান্য মানবিক সহায়তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনগুলো এই মানবিক কার্যক্রমে যুক্ত ছিল।
* ত্রাণ কার্যক্রম: যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য জরুরি সামগ্রীর তীব্র অভাব দেখা দেয়। জাতিসংঘ এবং এর বিভিন্ন সংস্থা (যেমন: ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) ত্রাণ বিতরণে সক্রিয় ছিল।
* প্রত্যাবাসন সহায়তা: দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতিসংঘ শরণার্থীদের নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবর্তনেও সহায়তা করেছিল।
৩. আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে:
জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা এবং বিতর্কের কারণে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও বিশ্বের মানুষের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়টি আরও বেশি পরিচিতি লাভ করে। যদিও এটি সরাসরি যুদ্ধের ফলাফল পরিবর্তন করেনি, তবে এটি বিশ্ব জনমতকে বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসতে সহায়ক হয়েছিল।
উপসংহার:
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল সীমাবদ্ধ, বিশেষ করে সামরিক হস্তক্ষেপে। তবে মানবিক সহায়তা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে আলোচনার মাধ্যমে এটি পরিস্থিতির উপর একটি পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছিল। পরাশক্তির রাজনীতি এবং ভেটো ক্ষমতার ব্যবহার সত্ত্বেও, জাতিসংঘের মানবিক কার্যক্রমগুলো লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচাতে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের প্রাথমিক পুনর্গঠনে সহায়ক হয়েছিল।

১৬ । প্রশ্নঃ বাকশাল কী ?

উঃ বাকশাল এর পূর্ণরূপ হলো বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। এটি ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি (আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫ তারিখে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাসের মাধ্যমে) তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত একটি রাজনৈতিক দল ও ব্যবস্থা। বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল।
বাকশালের পটভূমি ও গঠনের উদ্দেশ্য:
স্বাধীনতার পর (১৯৭২-১৯৭৪) বাংলাদেশে বেশ কিছু সংকট দেখা দেয়, যেমন:
* যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে সমস্যা
* খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ
* আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও চোরাচালান
* রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বিভিন্ন চরমপন্থী দলের তৎপরতা
* আন্তর্জাতিক দাতাদের অসহযোগিতা (কিছু ক্ষেত্রে)
এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি 'দ্বিতীয় বিপ্লব'-এর ডাক দেন এবং মনে করেন যে বিদ্যমান বহুদলীয় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা দিয়ে এই সংকটগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন এবং জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে দেশকে দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

বাকশাল গঠনের মূল উদ্দেশ্যগুলো ছিল:

* শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা: কৃষক ও শ্রমিকসহ মেহনতী ও অনগ্রসর জনগণের উপর শোষণ অবসানের জন্য পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শোষণমুক্ত ও সুষম সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।
* অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়ন: কৃষি ও শিল্পের প্রসার এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ও বন্টন নিয়ন্ত্রণে কৃষক-শ্রমিকের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান, মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ম্ভর অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করা।
* দুর্নীতি দমন: গণজীবনের সর্বস্তর থেকে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা মূলোচ্ছেদ করা।
* জাতীয় ঐক্য ও সংহতি: দেশের তৎকালীন অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিধান করা।
* প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ: আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণের সরাসরি সুবিধা নিশ্চিত করা। (যদিও বাস্তবে ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে রাষ্ট্রপতি ও দলের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল)।
* গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা: বিপ্লবোত্তর সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গণমুখী সার্বজনীন সুলভ গঠনাত্মক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

বাকশাল ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

* একদলীয় শাসন: বাকশাল ছিল একটি একক জাতীয় দল। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করা হয় এবং শুধু বাকশালকেই বৈধ দল হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
* রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার: সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, যেখানে রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং এর চেয়ারম্যান হন।
* মৌলিক অধিকারের সীমাবদ্ধতা: এই ব্যবস্থায় মৌলিক অধিকারের কিছু অংশ সীমিত করা হয় এবং ট্রেড ইউনিয়নসহ অন্যান্য পেশাজীবী ও গণসংগঠনকে বাকশালের অঙ্গ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করা হয়।
* গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ: ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন একটি আদেশের মাধ্যমে দেশের সকল সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র চারটি দৈনিক পত্রিকা (দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশ টাইমস, দৈনিক বাংলা এবং বাংলাদেশ অবজারভার) সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়, যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে ব্যাপকভাবে খর্ব করে।
* গ্রামভিত্তিক প্রশাসন ও উন্নয়ন: বাকশাল ব্যবস্থায় গ্রামকে প্রশাসনিক ও উৎপাদন ইউনিট হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

বাকশালের সমাপ্তি:

বাকশাল ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার মাত্র সাড়ে সাত মাসের মাথায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীতে সামরিক সরকার এবং জিয়াউর রহমানের সময়ে বহুদলীয় রাজনীতি পুনঃপ্রবর্তন করা হয়।

বাকশাল আজও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিতর্কিত বিষয়। এর সমর্থকরা এটিকে দেশের সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় একটি জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে দেখেন, যা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য ছিল। অন্যদিকে, বিরোধীরা এটিকে গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে সমালোচনা করেন।